শৈবতীর্থ বৈদ্যনাথ ধাম

শ্রী সুজিত পাঠক

বৈদ্যনাথ বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি, শিবপুরান অনুসারে। একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং জগত পরিচালন কর্তা শ্রীবিষ্ণু, তাদের মধ্যে কে বড় – এই নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন তাদের পরীক্ষা করার জন্য শিব ত্রিভুবন ভেদ করে এক অন্তহীন আলোকস্তম্ভ রূপে আবির্ভূত হন, যা জ্যোতির্লিঙ্গ। এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে এর উৎস অনুসন্ধান করতে বলেন। ব্রহ্মা যান উপরের দিকে এবং বিষ্ণু যান নীচের দিকে। কিন্তু কেউই এই স্তম্ভের তলাতল বা উৎস খুঁজে পান না।

দুর্গাপূজার দশমীর রাত, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, চরাচর জুড়ে নামলো বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা চললাম বাবা বৈদ্যনাথ ধামের উদ্দেশে।

রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেসের সজ্জিত কামরায় উঠে বসতেই চোখ জুড়ে এলো ঘুমের আবেশে। বাইরে তখনও চলছে দুর্যোগ। কাচের জানলা বেয়ে ছুটে আসছে বিদ্যুতের ঝলকানি।

ভোর পৌনে পাঁচটায় ভাঙলো ঘুম, থামলো গাড়ি। হ্যাঁ, যসিডি স্টেশনে এসে গেছি। ট্রেন এখানে আমাদের নামিয়ে ছুটে যাবে তার গন্তব্যে।

লাগেজ নিয়ে নামলাম ছিমছাম স্টেশনে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, গায়ে তেমন লাগছে না। হামলে পড়লো গাড়ির চালকের দল - বাবু কাঁহা জানা হ্যায়, কৌন সা হোটেল .... হামারা নয়া গাড়ি হ্যায়, আইয়ে ..... এমনই নানা কথার ডালি সাজিয়ে।

যাই হোক তিনশো টাকা চুক্তিতে একটা সুইফ্ট গাড়ি ঠিক করে বললাম, মন্দিরের কাছে কোনও হোটেলে চলো --

আড়মোড়া ভাঙা শৈব্য শহরে ঘুম ভাঙাচ্ছে প্রকৃতির আবছায়া আলো। বৃষ্টি আর পড়ছে না, তবে পথঘাট দেখে বোঝাই যাচ্ছে গতকাল রাত্রে কী তাণ্ডব চলেছে।

পনেরো মিনিটে চলে এলাম মন্দির। এলাকায় সার দেওয়া দামী, কম দামী হোটেল, ধর্মশালা। কিন্তু ভাগ্য এতটাই প্রসন্ন ছিল যে কোনও হোটেলেই ঠাঁই হলো না। সব বুকিং হয়ে গেছে।

আমাদের ক্যাপ্টেন নেট অন করে একটা হোটেলের খোঁজ পেল। ছুটলাম সেইদিকে। আসলে আপনি যেদিকেই থাকুন না কেন, সব হোটেলগুলোই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। কোনওটাই বেশি দূরে নয়, হাঁটা দূরত্বের মধ্যে।

হোটেল 'গীতাঞ্জলী' বেশ সুসজ্জিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল। সুইটের ভাড়া চব্বিশশো থেকে ছাব্বিশশোর মধ্যে। সুন্দর পরিবেশ, ব্যবহারও বেশ ভালো। এদের নিজস্ব রেস্তোঁরাও আছে, খাবারের মানও বেশ ভালো। ক্যাপ্টেন একটু চা-পাগল মানুষ। ঢোকা মাত্র লবিতে বসে 'চা' 'চা' করে চলেছে। আমি মুখে না বললেও মনটা 'চা' 'চা' আমারও করছে। প্রকৃতির খেলা জানা বড় দুষ্কর, এখন আকাশে পরিস্কার সূয্যিদেব পূবাকাশে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

শান্ত সকালে ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিয়ে যে যার রুমে চলে গেলাম। ফ্রেশ হয়ে বেরবো বাবা বৈদ্যনাথের দর্শনে। আমাদের হোটেল থেকে মাত্র পাঁচ কী সাত মিনিটের পথ, হেঁটেই যাওয়া যাবে।

আগে এই জায়গাটি সম্পূর্ণ বিহার রাজ্যের মধ্যে পড়তো। পরবর্তী সময় বিহার ভাগ হয়ে ঝাড়খণ্ড তৈরি হলে এটি ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত হয়। এই বৈদ্যনাথ ধামকে অনেকে বাবা ধাম নামেও চেনেন, যেটি দেওঘর জেলার অন্তর্গত। দেওঘরের অর্থ হলো দেবের ঘর বা দেবতার ঘর। বাবা ভোলেনাথ এখানে বৈদ্যরাজ অর্থাৎ চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কথিত আছে বৈদ্যনাথ দর্শনে রোগ, তাপ নাশ হয়। কঠিন ব্যাধি থাকলেও তা বৈদ্যনাথ নিরাময় হয়ে থাকে।

কী ভাবে বাবা বৈদ্যনাথ এখানে এলেন, এই স্থানের মাহাত্ম্যই বা কী - এমন নানা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এখানে অনেক কাহিনি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। সেই গল্পই আপনাদের শোনাবো।

আমরা সাধারণ মানুষেরা স্রষ্টার তৈরি সৃষ্টি দেখেই আনন্দ লাভ করি। স্রষ্টাকে বিচার করার বা তার সত্যাসত্য বিচার করার ক্ষমতা

আমাদের নেই। তাই যা বর্ণিত, চলিত গাথা হয়ে আসছে, তাইই সত্য ও চিরন্তন বলে আমাদের মেনে নিতে হবে।

হিন্দু বিশ্বাস মতে লঙ্কাপতি রাবণ এখানে বাবা ভোলেনাথকে খুশি করার জন্য ত্রিকূট পর্বতের এক গুহায় দীর্ঘদিন সাধনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভক্তিবান ও একনিষ্ঠ শিব ভক্ত ও পূজারি। তাই তিনি মহাদেবকে খুশি করতে যজ্ঞাগ্নীতে তার দশটি মাথা এক একটি করে আহুতি দিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ভক্তের কষ্ট কী ভগবান কখনও সহ্য করতে পারে? এখানেও তার অন্যথা হয়নি। বাবা ভোলেনাথ, যিনি এখানে স্বয়ং বৈদ্যরাজ তিনি এখানে অবতীর্ণ হন। এবং রাবণের সাধনায় তুষ্ট হয়ে রাবণকে সুস্থ করে তোলেন।

বৈদ্যনাথ বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি, শিবপুরান অনুসারে। একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং জগত পরিচালন কর্তা শ্রীবিষ্ণু, তাদের মধ্যে কে বড় - এই নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন তাদের পরীক্ষা করার জন্য শিব ত্রিভুবন ভেদ করে এক অন্তহীন আলোকস্তম্ভ রূপে আবির্ভূত হন, যা জ্যোতির্লিঙ্গ। এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে এর উৎস অনুসন্ধান করতে বলেন। ব্রহ্মা যান উপরের দিকে এবং বিষ্ণু যান নীচের দিকে। কিন্তু কেউই এই স্তম্ভের তলাতল বা উৎস খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্মা এসে শিবকে মিথ্যা বলেন যে তিনি উৎস খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু বলেন, তিনি খুঁজে পাননি। তখন ভোলেনাথ দ্বিতীয় জ্যোতির্লিঙ্গ রূপ ধারণ করেন। এবং মিথ্যা বলার জন্য ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে, কোনও অনুষ্ঠানে তার স্থান হবে না। এবং শ্রীবিষ্ণুকে আশীর্বাদ করেন যে, সৃষ্টির অন্তিম কাল পর্যন্ত বিষ্ণুর পূজা হবে। জ্যোতির্লিঙ্গ হলো সেই সর্বোচ্য অখণ্ড সত্যের প্রতীক। যার অংশ শিব স্বয়ং। এই সনাতন বিশ্বাস অনুসারে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরগুলিতে শিব স্বয়ং অগ্নিময়, জ্যোতিযুক্ত স্তম্ভ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আদিশঙ্করাচার্য্য রচিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের স্তোত্রম-এ বৈদ্যনাথ মন্দিরের স্তুতি করা হয়েছে -

'' পূর্বোত্তরে প্রজ্বালিকা নিধানে
সদাবসন্তং গিরিজাসমেতং
সুরাসুরার্বিতপাদপদম্
শ্রীবৈদ্যনাথং স্থানং নমামি''

এই স্তোত্র অনুসারে বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বাঞ্চলের এক প্রজ্জ্বলিকা নির্বাণ - অর্থাৎ 'চিতাভূমি' বা শ্মশানে অবস্থিত। চিতাভূমি শব্দটির এখানে একটি তাৎপর্য আছে। প্রাচীন কালে এই মন্দিরের কাছেই একটি শ্মশান ছিল। কাপালিক বা ভৈরব সাধনায় শিবকে শ্মশানভূমিতে পূজন করা হয়।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই স্থানে ভগবান শিব আদ্রা নক্ষত্রে রাত্রিবেলায় প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভবিষ্য পুরানেও বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের কথা আছে। আবার এই বৈদ্যনাথ মন্দিরটি সতীপীঠ অর্থাৎ একান্নপীঠের একটি পীঠ। এখানে সতীর হৃদয় পড়েছিল, তাই এটিকে হৃদয়পীঠও বলা হয়। সতী এখানে জয়দুর্গা নামে পূজিত হন এবং বৈদ্যনাথ তার ভৈরব। দেবী ভাগবত পুরান, কুব্জিকা তন্ত্র, কালিকা রহস্য, মুণ্ডমালা তন্ত্র এবং রুদ্রযামল তন্ত্রে বৈদ্যনাথের শক্তিপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথ ধাম একটি জনপ্রিয় তন্ত্র সাধন ক্ষেত্রও বটে।

বহু তান্ত্রিক তাদের তন্ত্র সাধনার স্থান হিসেবে বৈদ্যনাথ ধাম ও ত্রিকূট পর্বতকে বেছে নিয়েছে।

বৈদ্যনাথ ধামকে নিয়ে আছে নানা কিংবদন্তী, নানা গল্পগাথা, নানা লোকগাথা। শিবপুরানের কাহিনি অনুসারে কথিত আছে ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ তার রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শত্রুদের থেকে মুক্ত করতে মনে মনে স্থির করেছিলেন, যদি স্বয়ং ভগবান শিবের স্থায়ী বাসস্থান এখানে করা যায়, তবেই তার চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটবে। নয়তো সম্ভব নয়।

তখন তিনি ভোলেনাথকে খুশি করার জন্য শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। তার দীর্ঘ তপস্যায় খুশি হয়ে ভোলেনাথ নিজ হাতে একটি শিবলিঙ্গ রাবণকে প্রদান করেন। এবং বলেন, লিঙ্গটি লঙ্কায় স্থাপন করতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে। তবে এটি যেন অন্য কোথাও স্থাপন না করা হয় বা ভূমিতে না রাখা হয়। যদি এই দূর যাত্রাপথে রাবণ কোনও স্থানে ভুলেও লিঙ্গটি নামিয়ে রাখেন, তাহলে সেটি সেখানেই স্থায়ীরূপে থেকে যাবে।

আপ্লুত রাবণ আহ্লাদে গদ গদ হয়ে আনন্দ মনে লিঙ্গটি নিয়ে রওনা দেন তার রাজধানী শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে।

তখন অন্য দেবতাগ প্রমাদ গুণলেন। যদি ভোলেনাথের দেওয়া লিঙ্গটি রাবণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে, তাহলে তো সে অজেয় হয়ে উঠবে। সারা পৃথিবী তার অত্যাচারে কম্পিত হবে। এ হতে দেওয়া যাবে না। তখন তারা দলবদ্ধ ভাবে ছলনার আশ্রয় নিলেন, কী ভাবে রাবণকে বাধা দেওয়া যায়। তখন তারা পরিকল্পনা করলেন, জলাধিপতি বরুণদেব সুক্ষ্ম শরীরে রাবণের উদরে প্রবেশ করবেন। এবং মূত্রের বেগ উৎপন্ন করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাই হলো। কৈলাশ থেকে ফেরার পথে রাবণের মূত্রের বেগ পেল। তখন তিনি চারদিকে খুঁজতে লাগলেন কাউকে পাওয়া যায় কী না, শিবলিঙ্গটি যে একটু সময় ধরে দাঁড়াতে পারবে।

দেবতাদের বরাবরের ত্রাতা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু তখন এক ব্রাহ্মণের ছদ্মরূপ ধারণ করে রাবণের সামনে উপস্থিত হলেন। রাবণ ব্রাহ্মণকে পেয়ে তার হাতে শিবলিঙ্গটি দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণু তো সবই জানতেন। তিনি রাবণের অগোচরে লিঙ্গটি মাটিতে স্থাপন করে দিলেন। এবং নিশ্চুপে চলে গেলেন।

ফিরে এসে রাবণের মাথায় হাত। এ কী করলেন ব্রাহ্মণ! রাগে ক্ষোভে সে মাটি থেকে লিঙ্গটি তোলার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু তোলা তো দূর অস্ত, একচুল সেই লিঙ্গটি নড়াতে পারল না সে। বুড়ো আঙুলের ঘর্ষণ ও আঘাতে লিঙ্গটির একটি অংশ শুধু ভেঙে গেছিল। ব্যর্থ মনোরথে শিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাবণ মনোকষ্টে শ্রীলঙ্কা ফিরে গেলেন। দেবতারাও যারপরনাই খুশি হলো রাবণের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায়। জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন হয়ে গেল এই স্থানেই।

তবে রাবণ ফিরে গেলেও প্রতিদিন এখানে আসতেন শিবলিঙ্গে পূজা করতে। জনশ্রুতি বলে, রাবণ যেখানে নেমেছিলেন, সেটি অধুনা দেওঘরের 'হরিলাজোরি' বলে একটি স্থানে।

কথিত আছে রাবণের মৃত্যুর পর বহু বছর এই শিবলিঙ্গের পূজা বন্ধ ছিল। এবং নানা অযত্নে এটি পড়েছিল। অতঃপর আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বৈজু নামের এক ব্যাধ এই শিবলিঙ্গটি দেখতে পান এবং সেটিকে তিথি করে দেবতা বলে পূজা শুরু করেন। এবং তিনিই এটিকে বৈজুনাথ নাম দেন। পরে যা বৈদ্যনাথ নামে প্রচলিত হয়।

আজও বৈজুর বংশধরেরা সেবা করে চলেছে বাবা বৈদ্যনাথের। এবং সতীমন্দির থেকে বৈদ্যনাথ মন্দিরে যে রিবন লাগানো হয় বন্ধনের জন্য, সেই কাজ মন্দিরে উঠে এরাই করে থাকে।

সবাই মিলে চললাম মন্দিরে। বহু বছর আগে এসেছিলাম, এখনও তেমন কোনও পরিবর্তন নেই। শিবগঙ্গা নামের কুণ্ডের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি, জলে পা ডোবাতে গেলেও দশবার ভাবতে হবে - এতো নোংরা জল! কিছু ভক্ত অবগাহন করছে, কৌটো ভর্তি শিবগঙ্গার জল বিক্রি হচ্ছে। চারদিকে পেঁড়ার দোকান - এখানকার পেঁড়া খুবই বিখ্যাত, তবে আগেকার সেই স্বাদ আর নেই।

এখন নিয়ম হয়েছে, দূর থেকে লাইন দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দর্শন লাভ। আমরাও লাইনে দাঁড়িয়ে, কাঙ্খিত গর্ভগৃহের সামনে এসে দাঁড়ালাম। শীতল পরশ বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। দর্শন লাভ করলাম বাবা বৈদ্যনাথের। তাঁর মাথায় জল দিয়ে স্নান করিয়ে মন ভালো হয়ে গেল।

বেরিয়ে এসে একে একে মা জয়দূর্গা, ভৈরবনাথ, বগলামুখী, বজরংবলী সহ সকল মন্দির - যেগুলি বৈদ্যনাথ চত্বরে, সেগুলি সব দেখে আমরা ফিরলাম। কালকে যাব সাইট সিন দর্শনে।

হোটেল থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল। ত্রিকূট পাহাড়, বাসুকীনাথ, তপোবন, নলাখা মন্দির, সৎসঙ্গ আশ্রম - সব ঘোরাতে বাইশশো টাকা নেবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি স্করপিও গাড়ি।

তবে সৎসঙ্গ আশ্রম ও নলাখা মন্দির এবারে দেখতে পাইনি। কেননা অতিমারীর জন্য সেগুলি বন্ধ রাখা রয়েছে পর্যটকদের জন্য। যদিও ট্রেন থেকে নেমে এখনও পর্যন্ত কারো মুখে মাস্ক দেখিনি। সে রাস্তায় হোক বা মন্দিরের প্রচণ্ড লাইনে। আমরাই অচেনা গ্রহের মানুষের মতন মাস্ক পরিধান করে চলেছি।

সকাল হতেই গাড়ি হাজির। আমরাও ব্রেকফাস্ট করে তৈরি। ঝকমকে সকাল, আলো ঝলমল করছে। গাড়িতে উঠে বসলাম। ক্যাপ্টেনের আবার সব জায়গার সংস্কৃতি বা কালচারকে উপভোগ করার নেশা আছে। ঝাড়খণ্ডে এসে তাদের ভাষার গান শুনবে না, তা কী হয়!

গান চালাও - বলতে ধুমধাড়াক্কা গান চালু হলো গাড়ির মধ্যে। তার কোনটা শুরু, কোনটা শেষ, কোনটা প্রলাপ, কোনটা বিলাপ!! কিছুই বুঝলাম না। চালককে অনুরোধ করে অডিও বন্ধ করা হলো। শহরের হাতা ছেড়ে একটু এগোতেই পাহাড়ের হাতছানি চোখে এলো। একটু গ্রাম্য অঞ্চল দিয়ে চলেছি। প্রথম গন্তব্য বাবা বাসুকীনাথ। (৪৫ কিমি দূরত্ব)। দোকান পাট খুব কম রাস্তার ধারে - তবে রাস্তা ভালো। হঠাৎই নীল আকাশ কালো হতে লাগলো। ঝাপটে ধরে সূর্যের আলোটাকে নিভিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে লুটেরা কালো মেঘের দল। পৌঁছলাম বাবা বাসুকীনাথের মন্দিরে। এর গঠনশৈলীও বৈদ্যনাথ মন্দিরের মতোই। কথিত আছে বৈদ্যনাথ ও বাসুকীনাথ নাকি মামা ভাগ্নে সম্পর্ক। এবং বৈদ্যনাথে কিছু মানত করলে বাসুকীনাথে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে থাকে - সেই মানত কার্যকর হবে কী না।

যাই হোক মন্দিরে তেমন ভিড় নেই। শুধু গর্ভগৃহের মধ্যে মারাত্মক ভিড়। বাবার মাথায় ফুল জল নিবেদন করলাম। বাইরে এসে করলাম কর্পূরারতি।

এবার গন্তব্য ত্রিকূট পর্বত।

মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম সূর্যদেব আবার তার সোনালী কিরণ মেলে হাসছেন। তবে একটু রেগে, তাই তাপটা ভীষণ লাগছে। ঘেমে চান করে গেছি - কিছুটা গরমে, কিছুটা মন্দিরে কেউ জল দিতে গিয়ে আমার গায়ে ঢেলেছে। যাই হোক, গাড়ির এসি অন করতে একটু স্বস্তি। বেলা বেশ হয়েছে, খিদের অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

চালককে বলা হলো একটা ভালো খাবারের জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করাতে। তার সহাস্য জবাব - ইধার কুছ নেহি মিলেগা, ত্রিকূটকে পাস হ্যায়।

যাই হোক, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এক জায়গায় এসে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলাম। খরচ খুবই কম। পেটপুজো শেষ করে আবার ত্রিকূট অভিমুখে। গাড়ি পাহাড়ের কোলে দাঁড় করাতেই গাইড ছুটে এলো। চারশো ষাট টাকায় রফা করে চললাম ত্রিকূটের উপর।

রোপওয়ের ব্যবস্থা আছে, হেঁটেও ওঠা যায় - তাতে সময় লাগে দুঘণ্টা। রোপটাই ঠিক মনে হলো - দুহাজার পাঁচশো ফুট রোপওয়ে। তার পর আবার হাঁটা পথ। গাইড আগেই টিকিট কেটে রেখেছিলো। তাই লাইনে তেমন দাঁড়াতে হলো না।

ছোট্ট কৌটোতে আমাদের ভরে, তারে ঝুলিয়ে চালান করলো ত্রিকূটের উপর। এক রোমাঞ্চ ভরা অভিজ্ঞতা। ভালো লাগা, ভয় লাগা - সব মিলিয়ে ছিল। উপরে উঠতেই নামলো বৃষ্টি। এমন কথা ছিল না কিন্তু। আমাদের কথা দিয়েছিল - এমনটাও নয়!

যাইহোক কপিকুল আর মানুষকুল, এক সাথে ত্রিপলের ছাউনি করা দোকানে দাঁড়িয়ে কাকভেজা হতে লাগলাম।

বৃষ্টি কমতেই দেখলাম সীতার প্রদীপ, রাবণের পদচিহ্ন এবং রথের চাকার দাগ ও রথ নামার চাট্টান পাথর।

দর্শন হলো নারায়ন শিলা এবং রাবণের ধ্যানগুহা, যা প্রায় সত্তর ফুট মতো গভীর। গুহা মুখের কাছে গেলেও ভিতরে প্রবেশ করার সাহস হলো না। অনেক উৎসাহী জনগন ধীরে ধীরে নামছে, জানি না কতটা নামবে। পাশেই হাতি পাহাড়, কিন্তু পথের মধ্যেখানে গাছ ভেঙে পড়ে থাকায় আমরা যাওয়ার চেষ্টা করিনি। প্রসঙ্গত ত্রিকূটের নামকরণ তিনটি পাহাড়ের চূড়ার জন্য। একটি ব্রহ্মা, একটি বিষ্ণু এবং একটি মহেশ্বর - এই তিন মিলিয়ে ত্রিকূট। গভীর জঙ্গলে এখনও এমন কিছু ঔষধী গাছ জন্ম নেয়, যা নানা রোগের অপরিহার্য প্রতিকার হিসেবে গণ্য হয়।

বৃষ্টি থামলেও জমাট বাঁধা মেঘের দল হই হই করে ঢুকে আসছিলো রোপওয়েতে ঝুলে থাকা কৌটোগুলোর ভিতরে। অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে করতে যখন নেমে গাড়ির কাছে এসে হাজির হলাম, চরাচর জুড়ে সন্ধ্যার সামিয়ানা পাতা চলছে। বিশ্রামে গেছেন সূর্যদেব। অন্ধকার নেমে যাওয়ায় আর তপোবন যাওয়া হলো না।

পরদিন সকালে পরিষ্কার আকাশ মাথায় নিয়ে উপাসনা এক্সপ্রেস ধরতে যসিডি স্টেশনে পৌঁছলাম। যথাসময়ে ট্রেন এসে উপস্থিত হলো। দুহাত তুলে বাবা বৈদ্যনাথকে প্রণাম জানিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

আর শুরু হলো আকাশ ভাঙা বৃষ্টি!!!